সার্ধশতবার্ষিক স্মরণ

গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর রসবোধ

স্বরাজ মজুমদার

ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অতীত পরম তত্ত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, সেটি যে কী তা মুখে বলা যায় না। সবকিছুই 'উচ্ছিষ্ট' হয়েছে, একমাত্র ব্রহ্মই অনুচ্ছিষ্ট। তবুও তত্ত্বের আভাস দিতে গিয়ে উপনিষদ বলেছেন, ''রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।''[১] অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ। জীব সেই রসকে লাভ করেই আনন্দিত হয়। আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে উপনিষদের ঋষিরা বুঝিয়ে বলেছেন—কীরকম জানো? ওই আনন্দ নিত্য, শাশ্বত, অখণ্ড শুদ্ধচৈতন্যের আনন্দ, বোধাতীত বোধের আনন্দ। সেই আনন্দরসের সঙ্গে জাগতিক কোনও আনন্দের তুলনাই চলে না। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, যিনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, যিনি ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত বা তাতে দ্রবীভূত হয়ে যান, তাঁর ভিতর এই শুদ্ধচৈতন্যের আনন্দ খোলা বাতাসের মতো নিত্য খেলে বেড়ায়, যদিও তা সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এমনই এক ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যিনি স্বয়ং এক উচ্চকোটির ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় যাঁর আধ্যাত্মিকতা আঁকড়ে পাওয়া যায় না, সম্ভবত তিনিই বিজ্ঞানানন্দজীকে সর্বপ্রথম 'গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী' বলে চিহ্নিত করেন। তিনি বলতেন, ''ওঁকে চেনা মুশকিল। উনি কাউকে বড় একটা ধরা দিতে চান না।''[২] বাস্তবিক, এক ব্রহ্মজ্ঞানীই আর এক ব্রহ্মজ্ঞকে চিনতে পারেন, যাঁরা অগ্রগামী সাধক তাঁরা কেবল আভাসটুকুই পান।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ একবার বেলুড় মঠে আছেন (সম্ভবত ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ)। স্বামী ব্রহ্মানন্দও তখন মঠে। এক ভক্ত তাঁকে প্রণাম করতে এলে তিনি বলেন, ''হরিপ্রসন্ন মহারাজ এলাহাবাদ থেকে এসেছেন। তাঁকে দর্শন করেছেন? যান, যান, ঐ মহাপুরুষকে দর্শন করে আসুন! তিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, বস্তুলাভ করে বসে আছেন। ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর মুঠোর ভিতর; আত্মস্থ হয়ে আণ্ডিল হয়ে রয়েছেন। ওঁকে চেনা বড় মুস্কিল। উনি কাউকে বড় একটা ধরা দিতে চান না।''[৩]

কেন মুশকিল তার উত্তর দিয়েছেন ভাগবত। পরম ভক্ত উদ্ধবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ''বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ। বদেদুন্মত্তবৎ বিদ্বান্ গোচর্যাং নৈগমশ্চরেৎ॥'' (১১।১৮।২৯) অর্থাৎ—জ্ঞানী মহাপণ্ডিত হয়েও বালকের মতো খেলা করেন, সব বিষয়ে কুশলী হয়েও তিনি জড়ের মতো বসে থাকেন। তাঁর

আপাত-অসংলগ্ন কথা শুনে মানুষ তাঁকে উন্মত্ত মনে করে। বেদনিষ্ঠ হয়েও তিনি অনিয়ত আচরণ করেন, ইত্যাদি। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরেও শ্রীকৃষ্ণ এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, স্থিতপ্রজ্ঞ যে এরকম করেন, তার কারণ তিনি সমস্ত পার্থিব ভোগসুখ ত্যাগ করে আত্মানন্দেই তৃপ্ত হয়ে থাকেন (শ্লোক ৫৫)।

এই যে নিজের চারপাশে এক দুর্বোধ্য কুহেলিকার আবেষ্টনী সৃষ্টি করে আত্মগোপন করে থাকার স্বভাব, এ বিজ্ঞানানন্দজীর বরাবরই ছিল। ১৮৯৭ সালের গোড়ার দিকে তিনি যখন আলমবাজার মঠে যোগ দেন, তখনই দেখা যেত তিনি অত্যন্ত স্বল্পভাষী, চিন্তাশীল, গম্ভীর, ধ্যানপরায়ণ ও অন্তর্মুখ—হাসিঠাট্টায় বা গল্পগুজবে মোটেই যোগ দিতেন না। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদের 'ব্রহ্মবাদিন ক্লাব'-এ তাঁর দশ বছরব্যাপী যে-কঠোর সাধনভজনের জীবন শুরু হয়, সেখানেও তাঁর নিজেকে লুকিয়ে রাখার স্বভাবটি অক্ষুণ্ণ ছিল এবং পরে ১৯১০-এ মুঠিগঞ্জে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানেও, অন্তত প্রথম দিকে, তাঁর এই ভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। অনুমান, আপ্তকাম হওয়ার পর থেকে তাঁর এই ভাবের কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়, বিশেষত কিছু ঘনিষ্ঠ ভক্ত ও সন্ন্যাসীর কাছে। নাহলে তাঁর আপাতগাম্ভীর্যের বেড়াটি জীবনের শেষ দিন পর্যন্তই অটুট ছিল। এই যে নিজেকে লুকিয়ে রাখা, কারও কাছে ধরা না দেওয়া, এটি সম্ভব হত কী করে? তার প্রথম উত্তর এই, তিনি ছিলেন ছদ্মবেশী। বাহ্যত বিচিত্র কিম্ভূতকিমাকার পোশাক পরে নিজের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও মহিমাকে এমন করে ঢেকে রাখতেন যে, কী সন্ন্যাসী, কী সাধারণ মানুষ সকলেই বিভ্রান্ত হতেন। তাঁর পোশাক কীরকম ছিল? বিশাল জামা, তার ওপর ঢোলা সোয়েটার, তার ওপর পা-পর্যন্ত-নেমে-আসা ভোটকম্বলের কোট, মাথায় কানঢাকা বড় টুপি, শীত হোক গ্রীষ্ম হোক, পায়ে ডাবল মোজা, খাটো ধুতি, পায়ে জীর্ণ সাধারণ জুতো। জামা বা কোটের আবার অজস্র পকেট—তার মধ্যে বেশ কয়েকটা কলম, ছুরি, ঘড়ি, শেভিং সেট ও আরও হাজারো টুকিটাকি জিনিস!

পোশাক ছাড়াও আত্মগোপনের দ্বিতীয় উপায় ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ অদ্ভুত আচার-আচরণ, বালকসুলভ খামখেয়ালিপনা এবং সরল পরমহংসের স্পষ্টবাদিতা—কোনও আদবকায়দা বা শংকরাচার্য যাকে 'লোকানুবর্তনম্' (বিবেকচূড়ামণি, শ্লোক ২৭০) বলেছেন, তার ধার তিনি ধারতেন না। অবশ্য এটি সত্য যে তাঁর স্পষ্টভাষণে কোনও হুল থাকত না। সামনে হয়তো পরিহাসের সুরে কারও সমালোচনা করে আবার তারই আড়ালে তার প্রশংসা করতেন। এমন মানুষকে লোকে বুঝবে কী করে? আমরা তো এর ঠিক উলটোটাই করে থাকি! কিন্তু যিনি আত্মায় নিত্যপ্রতিষ্ঠিত, তিনি এসব লোকদেখানো শিষ্টাচারের ধার ধারতেও পারেন, নাও পারেন। বিজ্ঞানানন্দজী ধারতেন না। মহারাজের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে স্বামী অভয়ানন্দ বলেছেন, ''তাঁর আপাত-কঠিন কথাতেও থাকত একটি স্নিগ্ধ কৌতুকের সুর।''[৪]

তাঁর আত্মগোপনের তৃতীয় কৌশলটি ছিল বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল-এর ভাষায়, ''চোখ বুজে মিটমিটে হাসি আর তার ছেলেমানুষি''[৫] হাসি-ঠাট্টা করে অন্যের প্রশংসা ও স্তুতি উড়িয়ে দেওয়া।

চতুর্থ ও মোক্ষম উপায় ছিল যথাসম্ভব লোকসংস্রব এড়িয়ে চলা। অসাধারণ নির্জনতা-প্রিয়তা তাঁকে সর্বদা সংগুপ্ত থাকতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তিনি নীরস ছিলেন বা তাঁর কোনও রসবোধ ছিল না। রসস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কুস্তি লড়ে যাঁর অধ্যাত্মজীবনের হাতেখড়ি, যাঁর ভিতর সুকৌশলে প্রভু ব্রহ্মরসের বীজ বপন করে দিয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে রসবোধ

জাগ্রত হবে না, তো কার হবে? তবে সেই রসবোধ বহতা ছিল অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো, গুপ্ত সরস্বতীর মতো, যা দু-একজন অন্তরঙ্গ ছাড়া বাইরের মানুষ বড় একটা টের পেত না। আবার স্বেচ্ছায় যখন তিনি তাঁর সূক্ষ্ম ও উচ্চাঙ্গের sense of humour বা অসাধারণ রসবোধকে হাসিঠাট্টার মাধ্যমে প্রকাশ করতেন, তখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে গুপ্ত রাখা। স্বামী চেতনানন্দ যথার্থই মন্তব্য করেছেন : ''একজন যথার্থ বেদান্তবাদী—একজন ব্রহ্মজ্ঞ জানেন, জগৎটা স্বপ্নবৎ; অতএব, তাকে নিয়ে তিনি মজা করতে পারেন।''[৬]

গুরুগম্ভীর ও বিশ্লেষণাত্মক এই আলোচনার পর নেমে আসা যাক বিজ্ঞানানন্দজীর অসাধারণ রসবোধের রসভূমিতে, যেখান থেকে মহারাজের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের উপেক্ষিত একটি বিশেষ দিকের পরিচয় পাব আমরা। দেখব তাঁর অনাবিল আনন্দমূর্তি। পাঁচটি পর্যায়ে বিন্যস্ত এই বিচারণা। এক—নিজেকে নিয়ে তিনি কেমন মজা করতেন। দুই—গুরুভাইদের সঙ্গে তাঁর রহস্যালাপ। তিন—সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর রঙ্গ-রসিকতা। চার—দীক্ষিত ভক্ত ও অন্যান্য দর্শনার্থীদের সঙ্গে তাঁর হাসিঠাট্টা ও ফষ্টিনষ্টি। পাঁচ—বালক ও শিশুদের সঙ্গে তাঁর নানা কৌতুক ও মজার আচরণ। বলাবাহুল্য, এগুলি সবই সংগৃহীত বিজ্ঞানানন্দজীর জীবনী ও প্রকাশিত বিভিন্ন স্মৃতিকথা থেকে। লেখক তাঁদের সকলের কাছেই বিশেষভাবে ঋণী।

এক : নিজেকে নিয়ে মজা

অন্যকে নিয়ে রসিকতা করা সহজ; কিন্তু নিজেকে নিয়ে যিনি মজা করতে পারেন তিনিই বাহাদুর, কারণ অহংশূন্য না হলে এটি করা যায় না। নিরভিমানতা ছিল স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সহজাত ঐশ্বর্য, যা তাঁর রঙ্গকৌতুককে এক সুগভীর আধ্যাত্মিক মাধুর্যে ভরিয়ে তুলত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

(১) এলাহাবাদে থাকার সময় তাঁর ওই বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত হয়ে তিনি যখন এক্কা করে যেতেন তখন অনেকেই বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতেন; হয়তো ভাবতেন, ইনি আবার কোন গ্রহের বাসিন্দা! মহারাজও তাদের ওই কৌতূহল উপভোগ করে বলে উঠতেন—''ক্যা দেখতে হ্যায়? হাম্ বান্দর হ্যায়, রামজীকা বান্দর।''[৭] তিনি যে কেবল পরিহাসছলেই একথা বলতেন, তা নয়। সীতারামের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ একসময় বিজ্ঞানানন্দজী সম্পর্কে বলেছিলেন, ''ও পূর্বজন্মে কৃষ্ণের সঙ্গে কুস্তি লড়েছিল।''[৮] ঠাকুর এ-ও বলেছিলেন, ''ওর জাম্বুবানের অংশে জন্ম।''

(২) বিজ্ঞানানন্দ (তখন হরিপ্রসন্ন) প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করেন ১৮৮৩-র নভেম্বর মাসে। সঙ্গে ছিলেন সহপাঠী শরৎ (স্বামী সারদানন্দ)। সেখান থেকে তাঁরা মণি মল্লিকের বাড়ি যান। ঠাকুরের সঙ্গসুধা পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে যখন বেশ রাতে বাড়ি ফিরলেন তখন তিরস্কারের সুরে তাঁর মা বলেন, ''সেই পাগলার ওখানে গিয়েছিলে, যে সাড়ে তিনশ ছেলের মাথা খারাপ করে দিয়েছে?'' এই কথা স্মরণ করে পরবর্তী কালে মহারাজ রহস্য করে বলতেন, ''সত্যই মাথা খারাপ বটে—এখনও মাথা গরম আছে!''[৯] এই 'মাথা গরম' হওয়াটা যে কী বস্তু তা শ্রীরামকৃষ্ণ বা ঈশ্বর যাঁর মাথায় চড়ে বসেন, একমাত্র তিনিই কিছুটা আঁচ করতে পারবেন। সংসার যাঁর কাছে দাবানল মনে হয়, তিনিই একথার মর্ম বুঝবেন। স্বামীজীও একবার বিজ্ঞানানন্দজীকে বলেন, ''ঠাকুর তোমার আধারে একটু ভালরকম আস্তানা করে নিয়ে বসেছেন—আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি।''[১০]

(৩) যারা অবিশ্বাসী ও তথাকথিত আধুনিক, তারা দেবদেবীর দর্শন যে সম্ভব তা হেসে উড়িয়ে দেয়। উচ্চশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার বিজ্ঞানানন্দ সেকথা

ভাল করেই জানতেন। তাই স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ একবার মহারাজকে দিব্যদর্শন সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, ''হ্যাঁ ভাই, আমার ঐরূপ কিছু কিছু হয়েছে; কিন্তু মহারাজের [স্বামী ব্রহ্মানন্দের] আরও অনেক বেশি,'' এই বলে কৌতুকভরে বলেন, ''তবে ব্যাপার কি জান? আমার মাথাটা কিছু গরম—আর মহারাজের আরও বেশী।''[১১] ওই একই প্রশ্নের উত্তরে তিনি অন্যত্র মুচকি হেসে বলেন, ''তবে কি জান, [মহারাজ এবং আমার] দুজনেরই রাত্রিতে ঘুম কম হত কিনা—তাই ঐ রকম দেখতাম। তোমরা Young Bengal (তরুণ বাঙ্গালা) ওসব বিশ্বাস করো না।''

৪। শ্রীরামকৃষ্ণের ডঙ্কামারা বাণী—''আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।'' বাস্তবিক, আমাদের ঈশ্বর উপলব্ধি না হওয়ার কারণ এই 'আমিত্ব'। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, যোগ, যে পথ ধরেই সাধক এগোতে চান না কেন এই আমিত্বের জগদ্দলপাথরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলতেই হয়। এটিই ধর্ম বা অধ্যাত্ম জীবনের সার কথা। বিজ্ঞানানন্দজী যে ব্রহ্মজ্ঞানে বা আত্মস্বরূপে আরূঢ় হতে পেরেছিলেন তার কারণ ছিল তাঁর অভিমানরাহিত্য—অহংকার একেবারেই ছিল না। তাঁর করা আরও দু-একটি রসিকতা থেকেই তাঁর চরিত্রের এই দিকটি স্পষ্ট হবে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ। তখন তিনি মুঠিগঞ্জে। ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছেন। এমন সময় এক আই সি এস পরীক্ষার্থী ছেলে এসে পরীক্ষায় সফলতালাভের জন্য মহারাজের আশীর্বাদ চাইল। তার উত্তরে খুব হাসতে হাসতে মহারাজ বলেন, ''আমি তো সকলকেই আশীর্বাদ করি কিন্তু আমার আশীর্বাদের জোর থাকলে আমার কী আর এমন অবস্থা হতো, কত লোকজন এসে পড়ত!''[১২]

৫। এ বিষয়ে আর একটি দৃষ্টান্ত : একজন বাইরের সাধু সাত-আটটি কুমারীকে নিয়ে বেলুড় মঠে এসে মহারাজকে দর্শন করে বললেন, ''এরা ব্রহ্মচারিণী, মাথায় হাত দিয়ে একটু আশীর্বাদ করুন।'' মহারাজ রাজি হলেন না। বললেন, ''আমার কাছে স্পেশাল কেউ নেই, আমার কাছে সবাই সমান। আর আমার আশীর্বাদে কোনো কাজ হবে না; যদি হতো, তাহলে ওদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করার আগে নিজের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতাম। আমার আশীর্বাদ করবার কী অধিকার আছে, সবই সেই ঠাকুর, মা।''[১৩]

৬। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ—মহারাজ তখন মঠ-মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। ঠাকুরের নির্দেশে ও অন্তরের প্রেরণায় রেঙ্গুনে গেছেন! সেখানকার সেবাশ্রমে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘরের সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াতেই তাঁর মন্তব্য : ''বা! ঘরটি বেশ সুন্দর হে।'' সঙ্গী সন্ন্যাসী বললেন, ''আপনি মঠ-মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট; আর রেঙ্গুন আশ্রম মিশনের বড় কেন্দ্র। এতটুকু এরা করবে না?'' তিনি বললেন, ''না হে, না। আমি তো ভারি একটা লোক! এখানকার লোকেরাই ভাল। দেখলে না, জাহাজ ঘাটে সাহেবরা পর্যন্ত টুপি খুলে নমস্কার করলে? আর জামসেদপুরেও যখন টাটার কারখানা দেখতে গিয়েছিলাম, তখন তারা একটি চেয়ার দিয়েছিল বসতে! আরে ভায়া, আমরা সাধু সন্ন্যাসী, আমাদের যে এরা যত্ন করে, তা এরা ভাল লোক বলেই তো করে?''[১৪]

৭। আর একটি দৃষ্টান্ত। স্বামী ভাবাতীতানন্দ লিখছেন, ''তৃতীয়বার যখন তাঁকে দর্শন করি, মহারাজজী তখন রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ। একদিন সকালে তাঁর ঘরে গিয়েছি। মঠের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা তখন সারি দিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে এসেছেন। মহারাজজী তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন : 'কী ব্যাপার, এখানে কী দরকার?' ওঁরা বললেন : 'মহারাজ, প্রণাম করতে এসেছি।' তিনি বললেন : 'প্রণাম করতে হয় তো মন্দিরে, ঠাকুরঘরে যান। আমাকে প্রণাম করে কী হবে? আমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে?' ''[১৫]

দুই : গুরুভাইদের সঙ্গে রহস্যালাপ

স্বামী বিবেকানন্দ : গুরুভাইরা সকলেই ছিলেন বিজ্ঞানানন্দের চেয়ে বয়সে বড়। তাই এক ব্রহ্মানন্দ ছাড়া আর কারও সঙ্গেই তাঁর তেমন কোনও রসিকতা হত বলে জানা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দের কথাই ধরা যাক। তাঁকে মহারাজ চলমান শিব মনে করতেন। স্বভাবতই তাঁর প্রতি মহারাজের ছিল একধরনের ভয়মিশ্রিত গভীর সমীহর ভাব। স্বামীজীকে তিনি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। স্বামীজী কখনও ডাকলে তিনি বলতেন, ''এখন মশাই কাজে খুব ব্যস্ত আছি, পরে আসব'' ইত্যাদি। স্বামীজীও তাঁর স্নেহের 'পেসন'-এর মনোভাব জানতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে সহজ, সরল বালকসুলভ রসিকতার অভাব ছিল না। বিভিন্ন বিষয়ে তর্ক হত তাঁদের মধ্যে এবং তা থেকেও একটা নির্মল হাস্যরসের সৃষ্টি হত। দুটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে।

একদিন স্বামীজী বললেন, ''পেসন, দেশকালের উপযোগী করে নূতন স্মৃতি [শাস্ত্র] লিখতে হবে, বুঝলে? পুরানো স্মৃতি আর চলবে না।'' বিজ্ঞানানন্দ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, ''মশাই, আপনার স্মৃতি চলবে কেন, দেশ নেবে কেন?'' একথায় স্বামীজীর যেন একটু অভিমান হল। তখন ছোট ছেলেটির মতো স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ডেকে বললেন, ''রাখাল, শোন শোন! পেসন বলে, আমার কথা নাকি দেশ নেবে না।'' স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন মধ্যস্থতা করে বললেন, ''পেসন কি জানে? ও ছেলেমানুষ। তোমার কথা দেশ একদিন নিশ্চয়ই নেবে।'' এই রায় শুনে স্বামীজীর মহা আনন্দ। বললেন, ''শুনলে, পেসন? দেশ আমার কথা নেবেই।''[১৬]

স্বামীজীর প্রতি বিজ্ঞানানন্দজীর ভয়মিশ্রিত ভালবাসার সম্পর্কের একটি সুন্দর ছবি আমরা স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের বর্ণনা থেকেও পাই। বেলুড় মঠের পোস্তা বাঁধানোর খরচ বেড়ে যাওয়ায় স্বামীজী যে চটে লাল হন, একথা সকলেরই জানা। পোস্তার এস্টিমেট দেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্বয়ং, কারণ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে তিনিই ওই কাজের দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর স্নেহের পেসনকে কিছু না বলে স্বামীজী বকুনি দিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দকে, তাঁর 'অভিন্নহৃদয়েষু'কে। পেসনকে শিবের রোষ থেকে বাঁচানোর জন্য ব্রহ্মানন্দজী মুখ বুজে নিজেই সব গালমন্দ হজম করলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পর হরিপ্রসন্ন মহারাজের ভয় হল স্বামীজী হয়তো তাঁকেও একপ্রস্থ বকুনি-ঝকুনি দেবেন। তাই ঠিক করলেন কলকাতায় বলরামবাবুর বাড়িতে পালিয়ে গিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছেই দিনকয়েক কাটিয়ে আসবেন। গা ঢাকা দেবার এই ফন্দি করে, স্বামীজীকে কোনও কিছু না বলেই একদিন তিনি একটা চলতি নৌকা ডাকলেন। কিন্তু যেই নৌকায় উঠবেন, অমনি স্বামীজী উপর থেকে ঠিক দেখতে পেয়েছেন, আর দেখামাত্র উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, ''পেসন, যেও না, যেও না, তুমি রাজার (মহারাজের) কাছে যেও না—রাজা খুব ভাল লোক নয়।'' বিজ্ঞানানন্দজী পরে বলেছিলেন, ''আমি কি আর শুনি! তখনই নৌকোয় চড়ে তার ছইয়ের নীচে গিয়ে বসলাম।'' এক প্রশ্নের উত্তরে এও বলেছিলেন, ''জান কি ভাই, স্বামীজীকে ঐ রকম অল্পব্যয়ের খসড়া হিসাব না দেখালে তিনি কি কখনও ঐ কাজে হাত দিতেন?''[১৭]

স্বামী ব্রহ্মানন্দ : স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা রাজা মহারাজ ছিলেন বিজ্ঞানানন্দের নিরাপদ আশ্রয়। বিপদভঞ্জন। তাঁর সঙ্গে তাঁর একটা 'মেন্টাল অ্যাফিনিটি' বা ভাবগত সাদৃশ্য ছিল। সে কারণেই বোধহয় ব্রহ্মানন্দজীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেকটা সহজ ছিল। তাই স্বামীজীকে ভয়ে কিছুটা এড়িয়ে গেলেও রাজা মহারাজের ক্ষেত্রে সেটা হত না। তিনি

ভুবনেশ্বর বা অন্য কোথাও থেকে মঠে এলে বিজ্ঞান মহারাজ প্রায়ই বেলুড়ে এসে কিছুদিন থাকতেন। স্বামী অপূর্বানন্দ লিখেছেন, ''সেসময় মাঝে মাঝে এমনও হত যে—মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, সারদানন্দ মহারাজ, অখণ্ডানন্দ মহারাজ, সুবোধানন্দ মহারাজ এবং বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রমুখ ছ-সাতজন গুরুভাইয়ের মিলন একই সঙ্গে মঠে হত। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য। সর্বত্রই যেন আনন্দের হাট বসে যেত।"[১৮] কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক) ছেলেমানুষি রগড় করে আনন্দ করায় ব্রহ্মানন্দজীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া খুব শক্ত ছিল। কিন্তু আমরা দেখব বিজ্ঞানানন্দজীও এ-ব্যাপারে নেহাত কম যেতেন না। কখনও কখনও এমনও হয়েছে যে তিনি সঙ্ঘগুরুকেও বোকা বানিয়ে ছেড়েছেন। সেরকম একটি ঘটনা। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ত্যাগী শিষ্যরা অল্পবয়স্ক সাধুদের কঠোর ও একঘেয়ে মঠজীবনের ভার কিছুটা হালকা করার উদ্দেশ্যে তাঁদের নিয়ে মজা করতেন। একবার এক তরুণ সন্ন্যাসীর বক্তৃতা দেওয়ার খুব সাধ হয়। ব্রহ্মানন্দজী সেকথা জানতে পেরে একদিন এক সভার আয়োজন করে সকলকে সেই সভায় উপস্থিত থাকতে বললেন। সভা বসেছে বারান্দায়। বিজ্ঞানানন্দজীও আছেন। বক্তা সাধুটিও সেজেগুজে মাথায় পাগড়ি বেঁধে তৈরি। সভা শুরু হওয়ার ঠিক আগে ব্রহ্মানন্দজী আচমকা ঘোষণা করেন, ''আমি প্রস্তাব করছি স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী আজ সভায় পৌরোহিত্য করুন।" এসব কর্মে চিরকালই বিজ্ঞানানন্দজীর প্রবল অনীহা। কিন্তু সঙ্ঘগুরুর আদেশ তো তিনি ফেলতে পারেন না! তাই সঙ্গে সঙ্গে সুবোধ বালকের মতো উঠে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, ''আমি এখন সভার সমাপ্তি ঘোষণা করছি।" ব্যস্, এক মিনিটেই সভা শেষ! সকলেই ওঁর কাণ্ড দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন। রগড়ের মধ্য দিয়েই সভার ওইখানেই ইতি হল। বক্তার না বলা বাণী মনের ঘন যামিনীর মধ্যেই রুদ্ধ রইল![১৯]

খ) স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দ দুই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুভাই মাঝে মাঝে তাঁদের মনকে উচ্চভূমি থেকে নামিয়ে বালকসুলভ খেলা ও রঙ্গকৌতুকে মেতে উঠতেন। তাঁদের প্রিয় খেলাগুলির মধ্যে একটি ছিল ওয়ার্ড-মেকিং অর্থাৎ ইংরেজি শব্দ-রচনার খেলা। ''ইংরাজী শব্দরচনার খেলায় বাক্যরচনাও চলত। বাক্যগুলি চাপান-উতোরের মতো। একবার ওঁরা দুজনে পর পর চারটি বাক্য রচনা করেন, যথা—You are my host. Then give me a toast. For this you have to go to the other coast. Then I shall suffer most."[২০] অনুমান করি, প্রথম বাক্যটি ছিল বিজ্ঞানানন্দের, কারণ সঙ্ঘগুরু হিসাবে ব্রহ্মানন্দজীই তাঁর host, অর্থাৎ কিনা মঠের সর্বময় কর্তা। অবশ্য উলটোটাও হওয়া অসম্ভব নয়। বিজ্ঞানানন্দজীকেই মহারাজ host বানিয়ে ছেড়েছেন। সে যাই হোক, বাক্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের যে একটি সূক্ষ্ম রসসিক্ত ব্যঞ্জনা আছে তা লক্ষণীয়।

গ) বিজ্ঞানানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের মধ্যে আর এক ধরনের মজার খেলা চলত। একদিন দুজনে বসে গল্প করছেন। এমন সময় হঠাৎ কথা হল মহারাজ হরিপ্রসন্ন মহারাজকে কয়েকটি প্রশ্ন করবেন। তাঁকে ঠিক ঠিক উত্তর দিতে হবে। উত্তর ঠিক হলে প্রত্যেক প্রশ্ন পিছু মহারাজ বিজ্ঞানানন্দজীকে একশো টাকা দেবেন এবং ভুল হলে বিজ্ঞানানন্দকেই তা দিতে হবে। ব্রহ্মানন্দজী পর পর আটটি প্রশ্ন করলেন এবং বিজ্ঞানানন্দজী আটটিরই ভুল উত্তর দিয়ে আটশো টাকা বাজি হারলেন। ইতিমধ্যে প্রসাদের ঘণ্টা পড়ে গেল। তখন বিপদগ্রস্ত বিজ্ঞানানন্দজী বললেন, ''মহারাজ, আমি আপনার কাছে একটি জিনিস চাইব, আপনি দেবেন?" মহারাজ বললেন, ''দেব।" তখন বিজ্ঞানানন্দজী বলেন, ''আমি আপনার কাছ

থেকে ৮০০ টাকা চাইছি।" মহারাজ বললেন, ''বেশ দিলাম।" সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানানন্দজীও বলে উঠলেন : ''মহারাজ, তাহলে আমারও বাজির টাকা শোধ হয়ে গেল।"[২১] তখন একসঙ্গে দুজনার সে কী হাসি!

ঘ) বাজি ধরার খেলা ওইখানেই শেষ হয়নি। ১৯১৯-২০ সাল হবে। বিজ্ঞানানন্দজী তখন বেলুড় মঠে এসে রয়েছেন। গঙ্গার ধারে স্বামীজীর মন্দির নির্মাণের কাজ তদারক করছেন। একদিন ব্রহ্মানন্দজী জিজ্ঞাসা করলেন : ''পেসন, কাজ কেমন এগোচ্ছে?" বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, ''মাল-মশলার অভাবে কাজটা একটু ব্যাহত হচ্ছে।" ব্রহ্মানন্দজী বললেন, ''কিছু ভেবো না, আগামীকাল ভোরের আলো ফোটার আগেই নৌকাবোঝাই মাল এসে যাবে।" বিজ্ঞানানন্দজী সন্দেহ প্রকাশ করতেই মহারাজ বললেন, ''তবে বাজি হোক।" বাজি ধরা হতেই বিজ্ঞানানন্দজী রাতে নিজের ঘরে চলে গেলেন। সূর্যোদয়ের অনেক আগেই উঠে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখছেন নৌকা এসেছে কি না। দেখলেন নৌকার নামগন্ধ নেই! তখন খুশি হয়ে আবার খানিকটা শুলেন—কারণ বাজিতে মহারাজ নির্ঘাত হারবেন! ওদিকে মহারাজও কিছুক্ষণ পর ঘরের বাইরে এসে দেখেন নৌকা ভিড়েছে। তাই চুপচাপ তিনিও নিশ্চিন্তমনে ঘরে ফিরে গেলেন। সকাল হতেই বিজ্ঞানানন্দজী উৎফুল্ল মনে মহারাজের কাছে গিয়ে বললেন, ''দিন, বাজির টাকাটা দিন।" মহারাজের প্রশ্ন : ''কিসের জন্য?" মহারাজের এই কথায় বিজ্ঞানানন্দের টনক নড়ল; তিনি দেখলেন মালবোঝাই নৌকা ঘাটে দাঁড়িয়ে! পাশার দান এভাবে উলটে যাওয়ায় তিনি ছেলেমানুষের মতো বললেন, ''বেশ, বেশ। দেখুন মশাই, আমার তো টাকাকড়ি নেই; আমার হয়ে টাকাটা আপনিই দিন।" একথায় উপস্থিত সকলেই হেসে উঠলেন।[২২]

ঙ) স্বামী নির্বাণানন্দের স্মৃতিকথায় আর একটি বাজি ধরার কথা পাই : ''একদিন রাজা মহারাজ আর বিজ্ঞান মহারাজ কথা বলছেন, তখন স্বামীজীর ঘরের কাছে গঙ্গার ঘাটটা তৈরি হচ্ছে। নৌকায় করে চুন আসার কথা। মহারাজ বললেন, 'যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে মুশকিল হবে।' বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, 'না না, বৃষ্টি হবে না।' মহারাজ তখন বললেন, 'হ্যাঁ, বৃষ্টি হবে।' বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, 'না, কোথাও কিছু নেই, বৃষ্টি হবে না।' তখন দশ টাকা বাজি ফেলা হলো। নৌকা যখন প্রায় ঘাটের কাছাকাছি এসেছে—তখন মেঘ নেই, কিছু নেই, হঠাৎ কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে গেল। তখন রাজা মহারাজ বললেন, 'দে, দে, বাজির টাকাটা দে।' এমনি ওঁদের ছেলেমানুষি ছিল।"[২৩]

চ) ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য একদিনের এক মজার ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। মঠের দোতলার বারান্দায় দুখানা চেয়ারে বসে মহারাজ ও হরিপ্রসন্ন মহারাজ কৌতুকচ্ছলে কথা-কাটাকাটি করতেন। একদিন মহারাজ নিলেন আস্তিকের পক্ষ, হরিপ্রসন্ন মহারাজ নাস্তিকের। মহারাজ হরিপ্রসন্ন মহারাজের সব যুক্তি খণ্ডন করে দেওয়ায় তাঁকে হার মানতে হল। পরদিন মহারাজ নিলেন নাস্তিকের পক্ষ, আর হরিপ্রসন্ন মহারাজ আস্তিকের। এতেও মহারাজকে হারানো গেল না। কথা-কাটাকাটি হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যার সময় মহারাজ গঙ্গাজল স্পর্শ করতেন। সেবক তাঁর হাতে গঙ্গাজল ঢেলে দিচ্ছে দেখে এবার হরিপ্রসন্ন মহারাজ চেপে ধরলেন। কৌতুকের সুরে বললেন, ''এ কী হচ্ছে মহারাজ, এখন যে আস্তিকের মত কাজ হচ্চে?" মহারাজ বললেন, ''এটা কী জান—সংস্কার; গঙ্গাজল স্পর্শ করা একটা সংস্কারে দাঁড়িয়েচে; কোন মতেই একে আস্তিকতা বলা চলে না।"[২৪]

ছ) অরসিকের সঙ্গে রসালাপ অসম্ভব। বিড়ম্বনামাত্র। রসিকচূড়ামণি স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাই সুযোগ পেলেই টার্গেট করতেন বালকস্বভাবের

গুরুভাই বিজ্ঞানানন্দকেই। পরোক্ষভাবে এটি বিজ্ঞানানন্দের রসবোধের সপক্ষেও অকাট্য দলিল। তিনি তখন স্বামীজীর মন্দিরের কাজ দেখছিলেন। শীতের সকাল। মহারাজ দোতলায় গঙ্গার ধারের বারান্দায় বসে একটা মজার পরিকল্পনা ছকছিলেন। বিজ্ঞান মহারাজের জন্য কলকাতা থেকে একটা গরম কাপড়ের পাঞ্জাবি তৈরি করিয়ে এনেছেন। সেটি তাঁকে পরিয়ে কেমন মজা করা যায় তিনি সে-ফন্দিই আঁটছিলেন। সেবক নির্বাণানন্দজীকে দেখে তিনি বললেন, ''দেখ সুয্যি, পেসনকে নিয়ে একটু মজা করতে হবে। তুই গঙ্গাজলের পাত্রটা ঠিক করে রাখ। পেসনকে জামাটা 'সম্প্রদান' করতে হবে।" হঠাৎ দেখা গেল রামলালদাদা (ঠাকুরের ভাইপো) নৌকা থেকে নামছেন। মহারাজ খুব খুশি। বললেন, ''ভাল হয়েছে, রামলালদা-ই সম্প্রদান করবেন।" রামলালদাদা মহারাজের কাছে আসতেই মহারাজ তাঁকে বোঝাতে লাগলেন জামাটা কীভাবে বিজ্ঞানানন্দজীকে সম্প্রদান করতে হবে। ততক্ষণে বিজ্ঞান মহারাজও এসে গেছেন, তিনি লক্ষ করলেন মহারাজ রামলালদাদার সঙ্গে কী গুজগুজ ফুসফুস করছেন। দুজনকেই তিনি ভালমতো চিনতেন। তাই তাঁর ভয় হল তাঁর বিরুদ্ধেই বোধহয় দুজনে কিছু ষড়যন্ত্র করছেন। তিনি মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন, ''আমাকে নিয়ে কী-সব মতলব হচ্ছে?" মহারাজ যেন কিছুই জানেন না, এমনি ভালমানুষের মতো মুখ করে বললেন, ''তোমার জন্য একটা জামা আনিয়েছি, সেটা তোমায় দেব। মতলব আবার কী?" বিজ্ঞান মহারাজ নতুন জামা কিছুতেই নেবেন না, আর মহারাজও নাছোড়বান্দা। বিজ্ঞান মহারাজের ভয়, জামা দেওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই মহারাজের কোনও দুষ্টুমির মতলব আছে। যা হোক, শেষপর্যন্ত নিমরাজি হয়ে জামাটা গায়ে গলাতেই মহারাজ রামলালদাদাকে চোখ টিপে বললেন, ''তবে দাদা, এবার হোক।" অমনি রামলালদাদা কমণ্ডলু থেকে গঙ্গাজল ছিটিয়ে মহারাজের রচিত নানা উদ্ভট মন্ত্র উচ্চারণ শুরু করলেন। অবস্থা সঙ্গীন বুঝে বিজ্ঞান মহারাজ দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করলেন। মহারাজও চেয়ার ছেড়ে তাঁর পিছু ধাওয়া করলেন। বিপরীতদিক থেকে তখন অভেদানন্দজীও আসছিলেন। নির্বাণানন্দজী লিখেছেন, ''দু-জনের মধ্যে পড়ে বিজ্ঞান মহারাজের ছোট ছেলের মতো সে কী হাত-পা ছোঁড়া!" এ-দৃশ্য দেখে সকলেই হেসে কুটিপাটি।[২৫]

স্বামী শিবানন্দ : স্বামী শিবানন্দ বয়সে অনেক বড় হওয়ায় তাঁর সঙ্গে বিজ্ঞানানন্দজীর তেমন কোনও রসিকতা হত বলে জানা যায় না। তবে স্বামী অপূর্বানন্দ জানিয়েছেন, দক্ষিণভারতের নানা তীর্থ দর্শন করে বিজ্ঞানানন্দজী ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি বেলুড় মঠে এসে আহার ও বিশ্রামের পর মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করতে আসেন। প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী অপূর্বানন্দ লিখেছেন, ''পরস্পরের সাক্ষাতে কত আনন্দ, কত হাসি তামাসা ও রসিকতা!" তার পূর্ণ বিবরণ না দিলেও কথাবার্তার একটু উল্লেখ তিনি তাঁর 'সৎপ্রসঙ্গ'-এ করেছেন :

মহাপুরুষজী—''কোথায় কোথায় গিয়েছিলে?"

বিজ্ঞানানন্দজী—''মাদ্রাজ হয়ে মাদুরা ও ত্রিবেন্দ্রাম গিয়েছিলাম। কি বলব মহাপুরুষ মহারাজ—(হাত দিয়ে দেখিয়ে) এত বড় বড় ডাব নারিকেল ত্রিবেন্দ্রামে! একটা ডাবে পাঁচপো করে জল! আর কী মিষ্টি। তারপরে গেলাম কন্যাকুমারী ও রামেশ্বর। রামেশ্বরের মন্দিরটি বড়ই সুন্দর।... রামেশ্বর থেকে মাদ্রাজে ফিরে এসে বাঙ্গালোর, মহীশূর, উতকামুণ্ড দেখতেও গিয়েছিলাম। বেশ দেখাশুনা হল; খুব আনন্দও হয়েছে কিন্তু রসম্ কড়ম্বু খেয়ে খেয়ে অস্থির! এবার [মঠে] বেশ করে মুখ পালটানো যাবে।..." মহাপুরুষজী পরে বললেন, ''হরিপ্রসন্নকে দেখে খুব আনন্দ হল। আহা! কেমন বালকের মতন ওর স্বভাবটি।"[২৬]

স্বামী অখণ্ডানন্দ : সুরসিক স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে তাঁর একটি মধুর ও রসাত্মক পত্রালাপের কথা বলে গুরুভাইদের সঙ্গে বিজ্ঞানানন্দজীর রসালাপ-প্রসঙ্গ শেষ করব। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দের মহাসমাধির পর তৃতীয় অধ্যক্ষ হন স্বামী অখণ্ডানন্দ। সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষের পদটি খালি হওয়ায় তিনি এবং পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যরা স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীকে ওই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু বিজ্ঞানানন্দজীর তরফ থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই, কারণ ওইসব পদ-টদ একেবারেই তুচ্ছ তাঁর কাছে। ওইসব ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্তে তিনি আত্মানন্দ সম্ভোগ করতে চান। তাঁর সম্মতিলাভ করার জন্য অখণ্ডানন্দজী এক কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি কলমের প্রতি গুরুভাইটির দুর্বলতার কথা জানতেন। তাই চিঠিতে জানালেন : ''ভাই, আমাদের প্রস্তাবে তুমি সম্মতি দাও—না কোরো না। প্রস্তাবে সই করে পাঠালে তোমাকে একটি ফাউনটেন পেন উপহার দেব।'' বিজ্ঞানানন্দজী উত্তরে লিখলেন, ''ভাই কলমটা আগে পাঠাও—ঐ কলম দিয়েই আমি সম্মতিসূচক সই করব।'' অখণ্ডানন্দজী আর কী করেন! তড়িঘড়ি কলমটি পাঠালেন এবং বিজ্ঞানানন্দজীও সই করে দিলেন। তিনি হলেন সঙ্ঘের ভাইস প্রেসিডেন্ট।[২৭]

তিন : সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী পার্ষদদের সঙ্গে বিজ্ঞানানন্দের রঙ্গ-রসিকতার কিছু কথা আগের পর্বেই বলা হয়েছে। এখন বলার চেষ্টা করব সঙ্ঘের অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর কিছু রহস্যালাপ। এই পর্বটিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে। মহারাজ যখন এলাহাবাদের মুঠিগঞ্জ আশ্রমে ছিলেন, প্রথম পর্যায়ের ঘটনাগুলি সেই সময়কার। দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত সেইসব ঘটনাবলি ও কথাবার্তা যা বেলুড় মঠে বিভিন্ন সময়ে হয়েছিল।

মহারাজের ভাব ছিল যথাসম্ভব একা থাকা; মনে মনে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকা। তিনি বলতেন, ''যে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকে সেই প্রকৃত সাধু।... যে যত বড়; সে নিজেকে তত বেশী গোপনে ও নির্জনে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের এমনই অভ্যাস যে, নিজেকে প্রচার করতে চেষ্টা করি। এ ঠিক নয়।''[২৮] এই ভাব থেকেই তিনি এলাহাবাদ আশ্রমে যথাসম্ভব নিঃসঙ্গ থাকতেন। আশ্রম তখন খুব ছোট ছিল। আর্থিক অবস্থাও একেবারেই ভাল ছিল না—খুব টেনেটুনে আশ্রমের খরচ চালাতেন আর দিনরাত ধ্যান-জপ, শাস্ত্রচর্চা ও লেখালেখি নিয়ে থাকতেন। এই কারণে সঙ্ঘের কোনও সাধু এলেও সাধারণত তিনি আশ্রমে থাকতে দিতেন না। এই নিয়ে কোনও কোনও সন্ন্যাসী তাঁকে ভুলও বুঝতেন। ভাবতেন, তিনি বুঝি ব্যয়কুণ্ঠ। আদতে ব্যাপারটা কিন্তু তা ছিল না। যাই হোক, এই পর্বের কিছু রসসিক্ত ঘটনা ও কথাবার্তার মধ্য দিয়ে মহারাজের রসবোধের অনুধ্যান করব।

১। ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল। মহারাজকে দর্শন করতে এসেছেন বেনারস হয়ে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ। বললেন, ''মহারাজ, আপনার আশীর্বাদ নিতে এসেছি।'' সঙ্গে সঙ্গে ঠাট্টা করে বিজ্ঞানানন্দজী বললেন, ''আচ্ছা বেশ, দেখা তো হলো। এবারে যাও, কলে জল আছে, জল খেয়ে ফিরে যাও।'' রঙ্গনাথানন্দজীকে অবশ্য এপ্রিল ফুল হয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কলের জল খেতে হয়নি। এক বাঙালি ভক্তের বাড়িতে তাঁর ভালমতো আহারের বন্দোবস্তই হয়েছিল।[২৯]

২। নিজের কাছ থেকে কি কেউ টাকা ধার নেয়? বিজ্ঞানানন্দজী কিন্তু নিয়েছিলেন। ঘটনাটি শুনুন। মহারাজ তখন এলাহাবাদে। স্বামী

বিশ্বরূপানন্দের সঙ্গে তাঁর খুব সহজ ভাব। একদিন বিশ্বরূপানন্দ বললেন, ''মহারাজ, আপনি এমন করেন কেন? আমরা এলেই আপনি 'এখানে হবে না' বলে বিদায় করেন। কোথায় আমরা আপনাদের কাছ থেকে স্নেহভালবাসা পাব, তার পরিবর্তে এই রূঢ় ব্যবহার!''

মহারাজ : দেখো, আমি দশ হাজার টাকা ধার করেছি। এই ধার শোধ না হওয়া পর্যন্ত আশ্রমে লোকজন রাখা সম্ভব নয়—বুঝলে?

বিশ্বরূপ মহারাজের প্রশ্ন : এই দশ হাজার টাকা কোথা থেকে ধার করেছেন?

মহারাজ : আমার নিজের টাকা ছিল, তা থেকে নিয়েছি।

বিশ্বরূপ মহারাজ : টাকা আপনার নিজের—ধার হলো কী প্রকারে? এ যেন সেইরকম—দেনায় আমার মাথার চুলটি বিকিয়ে যাচ্ছে—গিন্নির কাছে এত, বড় ছেলের কাছে এত, বড় বৌমার কাছে এত... ইত্যাদি।

মহারাজ : তা যা-ই বল ভাই—সামনের হাতাটা (বস্তি) কিনতে আমার অনেক টাকা ধার হয়েছে। ঐ টাকা আমার চাই, নতুবা মিশন থেকে চলে যেতে বললে আমি খাব কী?

বিশ্বরূপ মহারাজ : আপনাকে চলে যেতে বলবে কেন? আর আপনার খাওয়া-পরার অভাবই বা হবে কেন?

মহারাজ : তুমি যা-ই বল, আমি ধারস্বরূপই নিয়েছি এবং তা আদায় না হলে আমি কিছু করতে পারব না।[৩০]

৩। একদিন এলাহাবাদের এক বৃদ্ধ অধ্যাপক বড় বড় তিরিশ-বত্রিশটা ডালপুরি আনলেন। বিশ্বরূপানন্দ লিখছেন, ''তখন রাতের খাবার তৈরি হয়ে গিয়েছে। মহারাজ বললেন, 'আশ্রমে যে-খাবার তৈরি হয়েছে, তোমরা তা-ই খাও। আমি বুড়ো মানুষ, যদি মরে যাই সেজন্য ঐ ডালপুরিগুলো আজই খাই; তোমরা সকালে খেয়ো।' সকালে আমাদের ডালপুরি পাঠাতে বিলম্ব করছেন দেখে মহারাজের কাছে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, 'মনে করেছ তোমাদের ডালপুরি দেব? সে কী আর আছে! রাতে উঠে দেখি খিদে পেয়েছে, তখন যা ছিল খেয়ে ফেললুম।' আমি অবাক! অতগুলো ডালপুরি নিজেই সব খেয়ে ফেললেন। ছেলেছোকরাদের জন্য কিছুই রাখেননি।

''একদিন আমি ও গিরিশ মহারাজ কুম্ভমেলা দেখতে গিয়েছি। আমরা প্ল্যান করলাম, মহারাজকে প্রণাম করে কিছু খাবার আদায় করব। তারপর তাঁকে প্রণাম করেই বললাম, 'মহারাজ, আমরা চললাম।' তিনি বললেন, 'কেন ভাই, এসেই চলে যাবে?' আমরা বললাম, 'যাব না তো কী করব? আপনি তো কিছুই খাওয়াবেন না। যা কেপ্পন (কৃপণ) আপনি! লোকে আপনাকে ভয়ানক কেপ্পন বলে।' তখন তিনি বললেন, 'কেন ভাই, কী খাবে তোমরা?' আমরা বললাম 'ডালপুরি'। অমনি বেণীর ওপর হুকুম হলো, 'বেণী, ডালপুরি বানাও।' ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খাবার তৈরি হয়ে এল। একসঙ্গে বসে ভরপেট খেলাম। তারপর তাঁকে প্রণাম করে ফিরবার সময় তিনি আমাদের বললেন, 'কী ভাই, আমাকে আর কেপ্পন বলবে না তো? আর যে যা-ই বলুক, তোমরা কিন্তু বোলো না।' ''[৩১]

৪। এই স্বামী বিশ্বরূপানন্দই একবার বিজ্ঞান মহারাজের কাছে দশ টাকা জমা রাখলে তিনি তিনটে খাতায় তাঁর নাম লিখে রাখেন। টাকা ফেরত দেওয়ার সময়ও আবার তিনটে খাতায় ''ফেরত পাইলাম'' বলে তাঁকে দিয়ে সই করালেন। বিশ্বরূপানন্দজী তো অবাক! বলেন, ''মহারাজ, এটা আবার কী ব্যাপার? সামান্য দশ টাকার জন্য এত দরকার কী?'' মহারাজের অকপট উত্তর : ''টাকা

তো টাকা! বাপকে বিশ্বাস নেই। ওর যা কৃত্য তা করতেই হবে।"[৩২]

৫। অক্ষয়চৈতন্য একবার মুঠিগঞ্জে গিয়ে দেড়দিন কাটান; অবশ্যই মহারাজের অনুমতিক্রমে। তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলতেই হবে, কারণ প্রথম দিনই হরিপ্রসন্ন মহারাজ তাঁকে তীর্থদর্শন সম্পর্কে কিছু উপদেশ দিয়ে বলেন, ''তোমাকে কৃষ্ণের বাঁশি শোনাব।" অক্ষয়চৈতন্য তো অবাক! তাঁর কৌতূহল তখন আর বাগ মানে না। পরদিন দুপুরে মহারাজ তাঁকে ডেকে রাস্তার ধারে নিয়ে যান। ওই সময় দূরে একটা স্টিম রোলার রাস্তা সমান করছিল। হঠাৎ তার ইঞ্জিনের বাঁশিতে তীক্ষ্ণ আওয়াজ হতেই মহারাজ বললেন, ''ঐ দেখ কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছেন।" অক্ষয়চৈতন্য হো হো করে হেসে উঠতেই আধবোজা চোখে মিটমিটে হাসি হেসে মহারাজ বললেন, ''হাসছ যে? কৃষ্ণ তো নিঃস্বার্থভাবে জগতের উপকার করেন, এমন নিঃস্বার্থ পরোপকার কে আর করছে বল?"[৩৩]

৬। এলাহাবাদে তখন নতুন রামকৃষ্ণ মন্দির তৈরি হয়েছে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে সেখানে প্রথম স্বামীজীর উৎসব হচ্ছে। অক্ষয়চৈতন্য সেই সভায় ঠাকুর ও স্বামীজীর মিলনকথার ওপর খুব হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেছেন। পরদিন বিকেলে স্বামীজীর শিষ্য সদাশিবানন্দের সঙ্গে বিজ্ঞানানন্দজীকে প্রণাম করতে গেলে মহারাজ বলেন, ''কাল তোমার বক্তৃতা মোটেই ভাল হয়নি।" অক্ষয়চৈতন্যের দিকে তাকিয়ে সদাশিবানন্দ বললেন, ''আপনি ঘাবড়াবেন না, উনি এরকম উলটো করেই বলে থাকেন।" বিজ্ঞানানন্দজী আবার বলতে লাগলেন : ''সাহেব Worship of the Terrible (ভয়ংকরের উপাসনা) সম্বন্ধে কেমন বললে! তুমি অপরের লেখা [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে বর্ণিত ঠাকুর-স্বামীজীর মিলনকাহিনি] নিয়ে বলেছ, নিজের চিন্তা দিয়ে বলতে চেষ্টা করবে। অবশ্য সাহেব যদি তোমার মত বলতে পারত, তাকে প্রশংসা করতুম, তোমাকে করব কেন?"[৩৪]

৭। স্বামী শিবস্বরূপানন্দ বিজ্ঞানানন্দজীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একদা বলেছিলেন, ''আমার সন্ন্যাসলাভের কয়েক বছর পরের কথা। বেলুড় মঠ থেকে এলাহাবাদে গিয়েছিলাম পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজকে দর্শন করবার জন্য। সকালে পৌঁছেছিলাম। মুঠিগঞ্জের আশ্রমে এসে তাঁকে প্রণাম করলাম। বললাম 'বেলুড় মঠ থেকে এসেছি।'

'' 'বেলুড় মঠ থেকে? ভাল। তা আপনিও কি চাবি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন?'—মহারাজজী আমার দিকে তাকিয়ে রহস্য করে বললেন। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। কোনও কথা না বলে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।'

''মহারাজজী তখন একটু হেসে প্রসঙ্গটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন, বেলুড় মঠের সাধুরা বড় ভুলো। কিছুদিন আগে ওখান থেকে একজন এসেছিলেন, উঠেছিলেন গেস্ট হাউসে। তাঁকে তাঁর ঘরের তালাচাবি দেওয়া হয়েছিল। কলকাতায় ফিরে যাবার সময় তিনি চাবিটা বেমালুম পকেটে নিয়ে গেলেন। ফলে সেই ঘরের তালা ভাঙতে হল। তাই জিজ্ঞাসা করছি, আপনিও কি চাবিটা সঙ্গে নিয়ে যাবেন?' "[৩৫]

৮। একবার বিজ্ঞানানন্দজী বেলুড় মঠের উদ্দেশে রওনা হবেন। যাওয়ার আগের দিন আশ্রমের সাধুকর্মীদের কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন। একজন নতুন ব্রহ্মচারী তখন এসেছেন। স্থানীয় মঠেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। তা, মহারাজ একজন ব্রহ্মচারীকে বললেন, ''ওকে কিন্তু খাটিও না। ও এখানে এসেছে একটু বিশ্রাম নেবার জন্য।"

মঠের সেই ব্রহ্মচারী তখন বললেন, ''না, মহারাজ! ওকে কিছুই করতে হবে না। বেশ

আরামেই থাকবে, কোন কষ্ট হবে না।"

এই কথা শুনে মহারাজের হাসি আর থামে না। তারপর বলছেন, ''তোমার কথায় গোপালদার [স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর] কথা মনে পড়ে গেল। নিত্যানন্দ মহারাজ আর গোপালদা বেলুড় মঠে আছেন। অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীও সেখানে উপস্থিত। নিত্যানন্দ স্বামী বললেন—'ওহে তোমরা এসো তো; এই জায়গাটা কুপিয়ে দাও তো। এখানে বেগুন আলু এই সব লাগাব।' ছেলেরা তা-ই করতে লেগে গেল। গোপালদা তাই না দেখে বলছেন, 'ওঃ ছেলেদের কি খাটুনিটা না হচ্ছে! আয়রে ছেলেরা, আয়, সব চলে আয়। অত করে কি ছেলেদের খাটায়?'

''গোপালদা সকলকে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর বলছেন কি—'ওরে তোরা, এই ফুল বাগানটা একটু কুপিয়ে দে তো।' তার মাটি আরও শক্ত! গোপালদার কথা শুনে স্বামিজী ও অন্যান্য সাধুগণ খুব হাসতে লাগলেন। তাই যখনই কারও কষ্ট দেখে কেউ আরাম দিতে চায়, অমনি গোপালদার কথা মনে পড়ে।"[৩৬]

৯। একবার এলাহাবাদে (১৯৩১) আন্তর্জাতিক ধর্মসম্মেলনে এক সন্ন্যাসী 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বাণী'-শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতাটি সন্ধ্যার আগে মহারাজকে পড়ে শোনানো হলে মহারাজ মন্তব্য করেন—''সবই বেশ বলা হয়েছে কিন্তু বক্তৃতায় 'নামের মহিমা' ও 'দান মাহাত্ম্য' এ দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই বাদ পড়ে গেল। কলিতে নামই সার—ঠাকুরও বলে গেছেন। 'তারকব্রহ্ম নাম', 'হরিনাম', 'মায়ের নাম'! মৃত্যুকালে যে নাম নেবে বা যেভাবে মন নিবিষ্ট থাকবে মৃত্যুর পরে তদনুরূপ গতিই লাভ হয়।" এই বলে মহারাজ একটি গল্প বলেন : ''মৃত্যুর সময় একজন খৃষ্টান ভক্তকে স্বর্গীয় দূতরা যীশুর ছবি দেখাতে এসেছেন। কিন্তু ভক্তটি সেদিকে না তাকিয়ে শয়তানের ইঙ্গিতে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিজ ভালবাসার পাত্রীর ছবি দেখতে লাগল এবং তাই ভাবতে ভাবতে তার মৃত্যু হওয়ায় সে নরকে গেল। শয়তানের ইঙ্গিতে চলার পরিণাম দেখ।"[৩৭]

১০। ১৯৩৩, ডিসেম্বর মাস। বিজ্ঞানানন্দজী কলম্বো যাওয়ার পথে মাদ্রাজে আসেন। মঠের নিচতলায় তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘরে বসে যখন একটার পর একটা জামা খুলছিলেন, স্বামী অজয়ানন্দ—যিনি তখন স্টুডেন্টস হোমের দেখাশোনা করতেন—জানাচ্ছেন : ''সে-সময় আমরা কৌতুকের সঙ্গে তা দেখছি দেখে তিনিও একটু হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, 'ঠাকুর যে প্যাঁজের খোসার কথা বলেছিলেন, এ তো প্রায় সেইরকম দেখছি মহারাজ।' শুনে তিনি বললেন, 'শরীরের মধ্যেই তো পঞ্চকোষ, তার উপর আরো ৭।৮টা রেখেছি, নইলে লোকে যে আত্মাকেও দেখে ফেলবে।' "[৩৮]

১১। শ্রীরামকৃষ্ণ তিনরকম একাদশীর কথা বলেছেন—নির্জলা একাদশী, দুধ-খই-ফলমূল খেয়ে একাদশী, এবং লুচি-ছক্কা খেয়ে একাদশী। বিজ্ঞানানন্দজী চতুর্থ একধরনের একাদশীর সন্ধান দিয়েছেন। তাকে বলা যায় 'চিকেন একাদশী'। মজার ঘটনাটি তাহলে বলি। তাঁর শিষ্যস্থানীয় স্নেহভাজন এক সাধু এলাহাবাদে এসে জানান একাদশীর দিন তিনি উপবাস করেন। যেহেতু সেদিন একাদশী, তিনি কিছু খাবেন না। বিজ্ঞানানন্দজী মুখে কিছু বললেন না। দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার সময় তিনি সাধুটিকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, ''বসে পড়।" সাধুটি তো মহা অপ্রস্তুত। আজ একাদশী। তিনি খান কী করে! তখন মহারাজ তাঁকে জোর করে খেতে বসান আর বলেন, ''আজ এই মুরগীর মাংস খেয়েই তুমি একাদশী কর।" সাধু পড়লেন মহা ফাঁপরে। গুরুর আদেশ কী করে তিনি লঙ্ঘন করবেন? ফলে ওইদিন থেকেই

তাঁর একাদশীর দফারফা হয়ে গেল। নিজ জীবনের এই ঘটনাটি সেই সন্ন্যাসী স্বামী বামনানন্দজীকে লক্ষ্ণৌ মঠে বলেন। সেখানেই তখন তিনি অবসর যাপন করছিলেন।

(১২) স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের সূত্রে আমরা জেনেছি যে স্বামীজীর মন্দির তৈরির জন্য বিজ্ঞানানন্দজী তখন বেলুড়ে এসে রয়েছেন। এটি সেই সময়ের ঘটনা। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর প্রায়ই বিজ্ঞানানন্দজী মুখ হাত ধোয়ার জন্য ছাদে না গিয়ে কাজটি স্বামীজীর ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সারতেন। ওদিকে তখন মঠে শালপাতার জায়গায় থালায় খাওয়া চালু হওয়ায় সাধুরা খাওয়ার পর নিজেরাই গঙ্গায় গিয়ে যে-যার থালা মেজে আনতেন। তারপর রাতে গঙ্গার দিকের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় তাঁদের চোখে পড়ত সিঁড়ির ওপর ও নিচে ময়লা জল জমে আছে। এটা ঠিক কার কীর্তি তাঁরা বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

একদিন রাতে থালা মাজতে নামছেন, এমন সময় জ্ঞানাত্মানন্দ ও আর কয়েকজন সাধু লক্ষ করেন, জল পড়ছে ওপর থেকে। তখন ডাকাবুকো স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ 'কে জল ফেলছে, কে জল ফেলছে' বলে চিৎকার করে উঠলেন এবং কারও সাড়া না পেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে দেখেন—সব ভোঁভাঁ—কেউ কোথাও নেই!

পরদিন যখন ওঁরা বিজ্ঞানানন্দজীকে প্রণাম করতে গেছেন, তখন চোখ দুটি বড় বড় করে মহারাজ বললেন, ''জান কি ভাই, কাল কি হয়েছিল?'' সাধুরা প্রশ্ন করেন, ''কী হয়েছিল মহারাজ?'' তখন তিনি বললেন, ''শোনোনি? দেখো, রোজই তো আমি এই বারান্দায় বসে রাতে হাত-মুখ ধুই। কালও তাই করছিলাম। এমন সময় ওই সাদা জ্যোতিষটা [স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ] 'জল ফেলে কে? জল ফেলে কে?' বলে মার মার করে উপরে উঠলো। আমি তখন তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। ভাবলাম, অত ঝামেলায় কে যায়? আর সে ঐরূপ করে কাউকে না দেখতে পেয়ে নিচে চলে গেল।'' সাধুরা বললেন, ''তা মহারাজ, আপনি কেন বললেন না, যে 'আমিই জল ফেলছিলাম'?' ওই কথা শুনে চোখ দুটি আরও বড় বড় করে—যেন ভয় পেয়েছেন—বলতে লাগলেন, ''জান না ভাই, ও যেরূপ মার মার করে এসেছিল, তাহলে ও নিশ্চয়ই আমাকে মেরে বসত!''[৩৯]

১৩। স্বামী অখণ্ডানন্দের মহাপ্রয়াণের পর বিজ্ঞানানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ হন ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। তার বছর দুই আগে গুরুপূর্ণিমার দিন। নতুন স্থানে ঠাকুরের মন্দিরের ভিত্তি পুনঃস্থাপনের জন্য তিনি মঠে এসেছেন। ভিতের ওপর ঠাকুরের প্রসাদী ফুল অর্পণ করতে হবে। গর্তের ভিতরে নামার জন্য কাঠের সিঁড়ির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু বালকস্বভাব মহারাজ গভীর গর্তের চারদিক ভাল করে দেখে হেসে বললেন, ''আমি ওই ইঁদুর-কলে পা দিচ্ছি না।'' তারপর ফুল নিয়ে তিনি এক সন্ন্যাসীর হাতে দিলেন এবং সেই সন্ন্যাসীই ওই ফুল ভিত্তিমূলে অঞ্জলি দেন।[৪০]

১৪। ১৯৩৮-এর জানুয়ারি মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিজ্ঞানানন্দজী মঠে এসে দিন কয়েক ছিলেন। সে সময়ের একটি ঘটনা। একদিন এক সাধু মহারাজকে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে আছেন। মহারাজ প্রথমে বললেন, ''দু-মিনিট'', অর্থাৎ দু-মিনিট আপনি ঘরে থাকতে পারেন। দু-মিনিট পেরিয়ে গেলে মহারাজ বলেন, ''এবারে আপনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করুন।'' এই কথায় ওই সন্ন্যাসী তক্ষুনি ঘরের বাইরে চলে যান; কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার নির্ভয়ে প্রত্যাবর্তন! বিজ্ঞানানন্দজী তো অবাক! তাঁর চোখে জিজ্ঞাসা। সাধুটিও এই আচরণের কারণ দেখিয়ে বলেন, ''আপনি তো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বলেছিলেন, তাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছি।'' একথায় মহারাজ হেসে উঠলেন।[৪১]

১৫। মহারাজের বালকস্বভাবের বর্ণনা দিতে

গিয়ে স্বামী জ্ঞানদানন্দ একটি মজার ঘটনার উল্লেখ করেছেন : ''বেলুড় মঠে তখন আছি, ১৯২১-২২ সাল হবে।...

''মঠে তখন তিনি স্বামীজীর মন্দিরের কাজ দেখাশোনায় ব্যাপৃত। একদিন বিকেল বেলা আমি ঐদিকে গিয়েছি। আমায় দেখে বললেন—'দেখ, মজুররা এখন কাজ ছেড়ে বাড়ী যাচ্ছে, ওদের ছুটি করবার সময় তো হয়নি এখনো। ওদের কাজ করতে বুঝিয়ে বল।' আমি গিয়ে তাই বলে এলাম। মজুররা হাত পা ধুয়ে বিজ্ঞান মহারাজের কাছে গিয়ে বলল, 'নীলকণ্ঠ মহারাজ আমাদের এখনও কাজ করতে বলছেন। এখন তো সন্ধ্যা হয়, ছুটির সময় তো হয়েছে।'

''এমন সময় আমিও সেখানে গিয়ে পড়েছি। আমায় দেখে তিনি মজুরদের তখন বললেন, 'উনি তো বলবেনই, এ সমস্ত কাজ কখনও করেন না—জানেন না যে, এ-কাজে কত পরিশ্রম।' ''[৪২]

জ্ঞানদানন্দ তো মহারাজের ওইরকম রসিকতা শুনে বোকা! আমরা সাধারণ মানুষ। আমরাও এসব শুনে ভাবি—মহারাজ কি তবে বরের ঘরের মাসি, আর কনের ঘরের পিসি? আসলে তা নয়। ওই যে ভাগবত বলেছেন, 'বুধো বালকবৎ'—এ ঠিক তাই। ব্রহ্মজ্ঞানীরা কার্য-কারণের বাইরে। তাঁদের আচার-ব্যবহার জাগতিক হিসেবনিকেশের মধ্যে ফেলা যায় না। তাঁরা প্রকৃতি বা জগৎসংসারের পারে বলেই জাগতিক নিয়মকানুনের দাসত্ব থেকে মুক্ত।

১৬। বিজ্ঞানানন্দজী মঠেই আছেন। একদিন সকালে স্বামী সত্যকামানন্দ তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে আছেন। আশেপাশে অন্যান্য সাধুরা। হঠাৎ দুষ্টু বালকের মতো সত্যকামানন্দের দিকে আঙুল উঁচিয়ে মহারাজ বলে উঠলেন : ''জানেন, ইনি লুকিয়ে লুকিয়ে তামাক খান?'' সত্যকামানন্দ তো অপ্রস্তুত। ভাবছেন—এ আবার কী ফ্যাসাদে পড়া গেল! যা হোক, যা হওয়ার তা হয়েছে ভেবে তিনিও অন্যান্যদের সঙ্গে হেসে উঠলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবছেন, ''মহারাজজীর কানে এই ছোট্ট ঘটনাটি এল কি করে?'' পরে অনুমান করলেন, এটি মহারাজের আদরের সেবক বেণীরই কীর্তি। কারণ ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বরে স্বামী শুদ্ধানন্দজী মহারাজের সেবক হয়ে তিনি প্রয়াগ আশ্রমে গিয়েছিলেন। শুদ্ধানন্দজী খুব তামাক খেতেন, তাই গড়গড়া ইত্যাদি সঙ্গেই থাকত। সত্যকামানন্দই তামাক সাজিয়ে এবং প্রয়োজন হলে ধরিয়েও দিতেন। তিনি ভাবলেন, ''চতুর বেণীর নজরে এইসব দৃশ্য কি আর লুকোনো ছিল? সেবক সেব্যের গড়গড়ায় টান লাগাচ্ছে—এই রোচক বার্তাটির রিপোর্ট দেওয়ার লোভ কী করে আর সে সংবরণ করে!''[৪৩]

১৭। পঞ্চদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী আত্মস্থানন্দজী তাঁর শ্রীগুরু স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ সম্পর্কে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কথা শুনিয়েছেন যা থেকে আমরা একাধারে যেমন বিজ্ঞানানন্দজীর রসবোধের পরিচয় পাই, তেমনই তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক ভাবতন্ময়তার বিদ্যুচ্চমকও আমাদের দৃষ্টিকে বাষ্পাকুল করে। তিনি বলেছেন : স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী তখন মঠের অ্যাকাউন্টসে কাজ করেন। [প্রণামীর সব] টাকাপয়সা গুনে গেঁথে থলি ভরে তিনি মহারাজকে দিলে, মহারাজ ওই থলিগুলো তাঁর বড় বড় পকেটের মধ্যে রাখতে রাখতে বলছেন, ''দেখছো, ঠাকুর কাঞ্চন স্পর্শ করতে পারতেন না, আর দেখছো তাঁর কেমন চেলা, পকেটে যাচ্ছে!'' এই কথা বলছেন আর হাসছেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখা গেল তাঁর মন সম্পূর্ণ এক অন্য ভূমিতে উঠে গেছে। তিনি তখন হাতজোড় করে গদগদস্বরে প্রার্থনা করছেন, ''জয় ঠাকুর, জয় ঠাকুর, জয় ঠাকুর! রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর। জয় ঠাকুর, জয় ঠাকুর, জয় ঠাকুর, জয় ঠাকুর!'' আত্মস্থানন্দজী বলছেন, ''কী মিষ্টি সে প্রার্থনা, কী অদ্ভুত আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতায় অভিস্নাত ও পরিপ্লাবিত ধারায় দেবশিশুর ঐ ভগবৎস্মরণ! স্তব্ধ ঘরে আমরা কিছুক্ষণ

ঐ আধ্যাত্মিক গঙ্গায় স্নান করে ধন্য ও কৃতার্থ হলাম।"[৪৪] বাস্তবিক, এইরকম রসিকতা হয়তো আমরা অনেকেই করতে পারি; চকিতে দিব্য রূপান্তর কজনের হয়? এটিই ভাববার।

১৮। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ। মহারাজ মঠ থেকে এলাহাবাদ ফিরবেন। হাওড়া স্টেশনে নির্দিষ্ট ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণির কামরায় বসে আছেন। কয়েকজন সাধু ও ভক্ত তাঁকে বিদায় দিতে গেছেন। সকলের মনই বেশ ভারাক্রান্ত। হঠাৎ মহারাজ এক সাধুর হাত থেকে তাঁর মানিব্যাগটা কেড়ে নিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : সেই সাধুটি বারবার তাঁর মানিব্যাগ ফেরত চাইছেন, কিন্তু তিনি দিচ্ছেন না। শেষে যখন সেই মহারাজ বললেন, ''ব্যাগ দিন, এখুনি গাড়ি ছেড়ে দেবে"—তখন বিজ্ঞান মহারাজ হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, ''ভালই তো হবে। এই নাও তোমার পয়সা, ব্যাগটা খুব ভাল, আমার পছন্দসই, আমি আর দেবো না।" এই নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাসাহাসি করে সকলের মনের ভারটা কাটিয়ে দিলেন।[৪৫]

১৯। মহারাজ ডাক্তার-বদ্যি দেখানো একদম পছন্দ করতেন না। শরীর খুব খারাপ হলে ব্রহ্মচারী পঞ্চাননের পীড়াপীড়িতে দু-এক ডোজ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেতেন মাত্র। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল—ঠাকুর যতদিন রাখবেন, ততদিনই থাকব। স্বামী নির্লেপানন্দকে একদিন তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ''যদি বাঁচতে চাও ডাক্তার কাছে ঘেঁষতে দিও না। লোকে মিতাহার বলে। এই দ্যাখো, আমি জীবনভোর বেদম খেয়েছি, বেদম হেগেছি।... বেলুড়ে বেশী থাকি না, তোমরা ডাক্তার দেখিয়ে আমাকে মেরে ফেলবে।"[৪৬] বলতেন, ''এঁরা [ডাক্তাররা] হচ্ছেন যমের দূত।"

শেষদিকে তাঁর পা দুটি বেশ ফুলেছিল। হজম হত না, খাবারেও অরুচি। মঠে আছেন তখন। তাঁর এক সেবক (মতান্তরে জনৈক ভক্ত) বলেন, ''মহারাজ একজন ভাল ডাক্তার দেখালে ভাল হয়।" তাঁর উত্তর : ''আমার ডাক্তারের উপর আদৌ বিশ্বাস নেই।" সেবক বললেন, ''একজন খুব বড় ডাক্তার মঠে যাতায়াত করেন, তাঁকেই ডাকা হবে। [তিনি] মহাপুরুষ মহারাজেরও চিকিৎসা করেছিলেন।" মহারাজ শুনে বললেন, ''তাঁর চেয়ে বড় ডাক্তার আছে?" সেবক বললেন, ''হাঁ, তা আছে। নীলরতন সরকার।" ''তাঁর চেয়েও বড় কেউ আছে?" ''না তো, তাঁর চেয়ে বড় ডাক্তার এখানে আর কেউ নেই"—হতাশ হয়ে সেবক বললেন। বিজ্ঞানানন্দজী তখন বললেন, ''একজন আছেন, তিনি হচ্ছেন ঠাকুর। তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই।"[৪৭]

স্বামী অপূর্বানন্দ এই ডাক্তার দেখানোর প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন : ''মঠে সেই সময় স্বামী শুদ্ধানন্দ রক্তের চাপ ও অন্যান্য অসুখে কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখবার জন্য একদিন মহারাজ নিচে এসেছেন। স্বামী শুদ্ধানন্দকে দেখে দু-চার কথার পরে বলছেন, 'ডাক্তার-ই আপনাকে মেরে ফেলবে, দেখছি।... ঔষধপত্র-ও তো অনেক খেয়েছেন, আর খাবেন না। ঔষধে কিছুই হয় না।' "[৪৮]

২০। শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—মা আমায় শুকনো সাধু করিসনি; রসে বশে রাখিস। তা, তাঁর চেলারাও আপন আপন ভাবে সে-ধারারই ধারক-বাহক। বাইরে থেকে বিজ্ঞানানন্দজীকে যেমনই মনে হোক, তিনিও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। অল্পবয়সী সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গেও তিনি তরুণের মতো রঙ্গ-রসিকতা করতেন। একটি দৃষ্টান্ত। স্বামী শর্মানন্দ সন্ন্যাসী হওয়ার আগে দীর্ঘদিন সরিষা রামকৃষ্ণ আশ্রমে ছিলেন। সেখানেই পড়াশোনা করতেন। সেখান থেকেই বিজ্ঞান মহারাজকে দর্শন করার জন্য মঠে আসতেন। একবার ওইরকম এসেছেন। মহারাজও তাঁকে দেখে খুশি। বলে উঠলেন, ''দেখিস সরষে, ছড়িয়ে পড়িস না যেন।"[৪৯] অর্থাৎ ঠাকুরকে ছেড়ে মনটা যেন সংসারে ছড়িয়ে না পড়ে।

এটি নিছক রসিকতাই ছিল না, ছিল আধ্যাত্মিক পথনির্দেশ। *(ক্রমশ)*

তথ্যসূত্র

১। *তৈত্তিরীয়োপনিষদ*, ২।৭

২। সংকলক : স্বামী চেতনানন্দ, *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০১৪), পৃঃ ৪ [এরপর, *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*]

৩। সংকলক : স্বামী অপূর্বানন্দ, *সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৯), পৃঃ ২০ [এরপর, সৎপ্রসঙ্গে]

৪। সম্পাদক ও সংকলক : সুরেশচন্দ্র দাস ও জ্যোতির্ময় বসুরায়, *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৩), পৃঃ ২৫৫ [এরপর, *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে*]

৫। বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, সম্পাদনা : অসীম চট্টোপাধ্যায়, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত* (রূপকথা : কলকাতা, ২০০৮), পৃঃ ২৩৫

৬। Swami Chetanananda, *God Lived with Them* (Advaita Ashrama : Kolkata, 1998), p. 615 [এরপর, *God Lived with Them*]

৭। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), ভাগ ২, পৃঃ ১১৫ [এরপর, *ভক্তমালিকা*]

৮। দ্রঃ *God Lived with Them*, p.591

৯। *ভক্তমালিকা*, পৃঃ ৯৬

১০। *সৎপ্রসঙ্গে*, পৃঃ ১২৬

১১। *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে*, পৃঃ ২৪৫; *ভক্তমালিকা*, পৃঃ ১১০

১২। *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*, পৃঃ ৮০

১৩। তদেব, পৃঃ ২১২

১৪। দ্রঃ *সৎপ্রসঙ্গে*, পৃঃ ১৭০

১৫। *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে*, পৃঃ ১৯৯

১৬। *ভক্তমালিকা*, পৃঃ ১০২-০৩

১৭। *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে*, পৃঃ ২৪২-৪৪

১৮। *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*, পৃঃ ৪৭

১৯। দ্রঃ *God Lived with Them*, p.617

২০। *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে*, পৃঃ ২০০

২১। তদেব, পৃঃ ২০০-০১

২২। দ্রঃ *God Lived with Them*, p.613

২৩। *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*, পৃঃ ২১

২৪। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, *ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা* (ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৩৯৫), পৃঃ ১৪৭-৪৮

২৫। *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*, পৃঃ ২১-২২

২৬। *সৎপ্রসঙ্গে*, পৃঃ ৮৬-৮৭

২৭। দ্রঃ *God Lived with Them*, p.614

২৮। *সৎপ্রসঙ্গে*, পৃঃ ১৭৭

২৯। দ্রঃ *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*, পৃঃ ১২১

৩০। তদেব, পৃঃ ৩৬-৩৭

৩১। তদেব, পৃঃ ৪০-৪১

৩২। তদেব, পৃঃ ৪১

৩৩। দ্রঃ *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে*, পৃঃ ২৬-২৭

৩৪। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ২৮-২৯

৩৫। তদেব, পৃঃ ১৯৩

৩৬। *সৎপ্রসঙ্গে*, পৃঃ ৭০-৭১

৩৭। তদেব, পৃঃ ৭৭

৩৮। দ্রঃ *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে*, পৃঃ ৬৭

৩৯। দ্রঃ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, *পুণ্যস্মৃতি* (উদ্বোধন কার্যালয়), পৃঃ ৮৪-৮৫

৪০। *প্রত্যক্ষদর্শীর* স্মৃতিপটে, পৃঃ ১৬৯

৪১। *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*, পৃঃ ১৫৩

৪২। *প্রত্যক্ষদর্শীর* স্মৃতিপটে, পৃঃ ৩৭-৩৮

৪৩। তদেব, পৃঃ ৪৭-৪৮

৪৪। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৩৬

৪৫। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৩৩৬

৪৬। তদেব, পৃঃ ২১৩

৪৭। দ্রঃ সৎপ্রসঙ্গে, পৃঃ ১৮৭; ভক্তমালিকা, ভাগ ২, পৃঃ ১০৬

৪৮। সৎপ্রসঙ্গে, পৃঃ ১৮৭

৪৯। *প্রত্যক্ষদর্শীর* স্মৃতিপটে, পৃঃ ২০২